আকবর রাজপুতদের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন? তাঁর রাজপুত নীতি রাজনৈতিক প্রয়োজনে কতটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল?

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজপুত জাতির সঙ্গে মুঘল সম্রাট আকবরের উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং উচ্চ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করে থাকেন। 1562 খ্রীষ্টাব্দে অম্বরের রাজা ভারমল তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নিজ কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহ দেন। অম্বর থেকেই মানসিংহ ও ভগবন্ত দাস আকবরের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁরা ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়করণে ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এই ঘটনা আকবরের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজপুত জাতির সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যত কর্মপন্থা এখানেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল বলা যেতে পারে।

সতীশ চন্দ্র মনে করেন, আকবরের রাজপুত নীতিকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে — 1572 খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট অভিযান পর্যন্ত প্রথম পর্ব, 1578 খ্রীষ্টাব্দে মুঘলদের কাশ্মীর এবং উত্তর-পশ্চিম অভিযানের প্রস্তুতির লগ্নে পাঞ্জাবের ভেরায় রাজা ভগবন্তদাস এবং মানসিংহের যোগদান পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব এবং আকবরের রাজত্বের বাকী বছরগুলি হল তৃতীয় পর্ব। শেষ জীবনে হুমায়ুন রাজপুতদের নিজ পক্ষে আনার জন্য সচেষ্ট হলেও সেই সময় ছিল না। রাজপুতদের মুঘল আমীরমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করার নীতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ-রই প্রাপ্য বলে *আব্দুল বাকী নহ্‌ওয়ন্দভী* তাঁর *'মাসির-ই-রোহিনী'* গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তিনি নিজের আধিপত্য সুদৃঢ় করার জন্য চাঘতাই অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করে রাজপুতদের কিয়দংশে ক্ষমতার ভাগ দিতে থাকেন। আকবর ইতিপূর্বে উজবেক ও মীর্জাদের বিদ্রোহের ফলে স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তাই আকবর আফগান, তুর্কী ও মোঙ্গলদের মধ্যে একটা ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য রাজপুতদের নিজ দরবারে সম্মানিত ও সমমর্যাদাপূর্ণ সদস্য হিসাবে স্থান দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। এইভাবে একদিকে যেমন তিনি রাজপুত জাতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন, অন্যদিকে তেমনি তাদের মুঘলদের পরম সুহৃদে পরিণত করে ভারতবর্ষে মুসলমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার এক নতুন ভিত্তি স্থাপন করেন। ড. বেণীপ্রসাদের মতে, আকবরের রাজপুত নীতির ফলেই মুঘলদের চারপুরুষ ধরে মহান রাজপুত শক্তির সেবা ও সাহায্যলাভ সম্ভব হয়েছিল। আকবর মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ধর্মান্ধতার পরিবর্তে উদারতার প্রসার ঘটিয়ে এক নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন।

রাজপুতানায় মুঘলদের সম্পর্ক বিস্তারের কাহিনী লিখতে গিয়ে *আবুল ফজল* রাজপুতদের মূলতঃ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন — (i) স্থানীয় *জমিন্দার, বুমিয়ান, মর্জাবান* ইত্যাদি এবং (ii) তাদের প্রজা, যেমন, *রায়ত* ও *মরদুম*। আকবর রাজপুতানায় স্থানীয় রাজন্যবর্গকে হয় পরাজিত করেছিলেন, নয়তো অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন এবং তারপর তাঁদের সাম্রাজ্যের অংশীদার করেন। এই নীতিকে সফল করার জন্য 1561-62 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বিবাহের কুটনীতি চালু করেন। তিনি ভারমলকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দান করে মৈত্রী স্থাপন করেন। তারপর পুত্র সেলিমের সঙ্গে ভগবানদাসের কন্যার বিবাহ দেন এবং অন্যান্য রাজপুত রমণীদের সঙ্গেও সেলিমের বিবাহ দেওয়া হয়। রাজপুত মহীষীর গর্ভজাত সন্তান সেলিমকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। 1568 ও 1569-70 খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে চিতোর ও রণথম্ভোরের পতন ঘটে। বিকানীরের রাজা কল্যাণমলের ভাইয়ের এক কন্যাকে, জয়সলমীরের রাওয়াল হর রাইয়ের কন্যাকে এবং যোধপুরের রাজা চন্দ্রসেনের কন্যাকে আকবর বিবাহ করেন। বেণীপ্রসাদ *"History of Jahangir"* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ভারতীয় রাজনীতিতে নবযুগের সূচনা হয়েছিল।

অবশ্য কোনও কোনও ঐতিহাসিক আকবরের এই নীতিকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের মন্ত্ররূপে দেখেছেন। তাঁদের মতে, রাজপুত কন্যাদের আকবর জোর করে বিবাহ করেছিলেন। এই তথ্য যথার্থ নয়। তিনি রাজপুত নারীদের হারেমে বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন এবং কখনোই তাদের নিজস্ব ধর্মাচরণে বাধা সৃষ্টি করেননি। বহু রাজপুতকে মুসলমান কর্মচারীদের মতো সমমর্যাদার মনসব প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে নিয়োগ করেছিলেন। *জে. এফ. রিচার্ডস্*-এর মতে, বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে মুঘলদের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যদিকে রাজপুতদেরও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি এর দ্বারা তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি। যদি তা হত, তাহলে রাজপুতানায় সামাজিক বিক্ষোভ সৃষ্টি হত বলে *"The Mughal Empire"* গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন।

মুসলমান অধিকারের প্রথম থেকে এমন কতকগুলি প্রথা প্রচলিত ছিল, যা ভারতের সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রজাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, যেগুলিকে 1562-64 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আকবর রোহিত করেন। হিন্দু তীর্থযাত্রীকর এবং জিজিয়া কর তিনি তুলে দেন। উপরন্তু যুদ্ধবন্দী হিসাবে ক্রীতদাস করার রীতি নিষিদ্ধ করেন। রাজপুতদের ঘোড়াগুলিকে চিহ্নিত করা থেকে অব্যাহতি দেন

এবং রাজপুত রাজ্যগুলির সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন। রাজপুত প্রধানদের মুঘল হারেমে বিবাহযোগ্যা কন্যা প্রেরণ করাকে নিষিদ্ধ করেন।

আকবর রাজপুতদের ক্ষেত্রে অস্ত্র ও মৈত্রী নীতি একই সাথে গ্রহণ করায় আকবরের কূটনীতিকে *"a master stroke of deplomacy"* বলে অভিহিত করা হয়। রাজপুতদের সঙ্গে তিনি কূটনীতি ও আপোষনীতিকেই গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। একমাত্র মেবারের ক্ষেত্রেই তাঁকে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল। কারণ প্রতাপ সিংহ আকবরের মৈত্রী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অথচ দিল্লী বা আগ্রা থেকে গুজরাটকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ভৌগোলিক দিক থেকে সমগ্র রাজপুতানাকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার ছিল। তাই গুজরাট বিজয় সমাধা করে আকবর মেবারের দিকে নজর দেন। 1573-74 খ্রীষ্টাব্দে আকবর অম্বরের মানসিংহের নেতৃত্বে দুটি প্রতিনিধিদল মেবারে পাঠান। কিন্তু রানা প্রতাপের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়নি। তাই 1576 খ্রীষ্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে মানসিংহের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী রানা প্রতাপকে পরাজিত করে। তবে এর ফলে কুম্ভলমের, গোগুণ্ডা ও উদয়পুরে সেনাছাউনি স্থাপন করে মুঘলরা প্রতাপ ও তাঁর পুত্রকে কেবলমাত্র মেবারের দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্বত্য এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করেছিল। মেবার অভিযানকালে আকবর কূটনীতির দ্বারা প্রতাপের দুই ভাই জগমাল ও শক্তিসিংহকে এবং মেবারের সামন্ত রাজপুরার রাইদুর্গা শিশোদিয়কে উচ্চ মনসব ও জায়গীর প্রদান করে নিজপক্ষে নিয়ে আসেন।

মেবারের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কাছোয়া রাজপুতদের রাজধানী অম্বরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে অম্বরের রাজাকে বংশানুক্রমিক উচ্চ মনসব দেওয়ার প্রথা চালু করেন। প্রথা ভেঙে তিনি মানসিংহকে দশ হাজারী মনসব দেন। অন্যান্য সামন্তদেরও মনসব দেন এবং রাজপুতানার যে সকল রাজা ও সামন্ত মুঘলদের মনসব গ্রহণ করেন তাদের নিজ নিজ রাজ্যকেই জায়গীর হিসাবে চিহ্নিত করা হল। এগুলি সবই ছিল বংশানুক্রমিক বা *ওয়াতন* জায়গীর। বহুক্ষেত্রে *ওয়াতন* থেকে যা আয় হত, তার থেকে মনসব পদের বেতন ছিল বেশী। সেক্ষেত্রে অন্যত্র জায়গীর দিয়ে তা পুষিয়ে দেওয়া হত। এছাড়া দেখা যায়, মৌসুমী কৃষকদের বড় অংশই রাজপুত রাজাদের সেনাদলের অংশ হওয়ার সুবাদে মুঘল অভিযানের অংশীদার। ফলে রাজপুতানার অর্থনৈতিক উন্নতিও ঘটতে থাকে। তবে কোনও সময়েই আকবর তাঁর সার্বভৌম অধিকার ভুলে যাননি। তিনি সব সময়েই প্রমাণ করেছিলেন ক্ষমতায় টিকে থাকার বিষয়টি মুঘল সম্রাটের ইচ্ছাধীন এবং সিংহাসন প্রাপ্তির মানদণ্ড উত্তরাধিকার নয়, সম্রাটের কৃপা।

এ প্রসঙ্গে আকবরের রাজপুত নীতির সঙ্গে আফগান নীতির পার্থক্য দেখা যায়। আফগানদের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। রাজপুতদের প্রতি আকবরের উদারনীতি অবলম্বনের পশ্চাতে তাঁর কতটা ধর্মনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, কিংবা তা কতটা প্রয়োজনভিত্তিক ছিল, তা বিতর্কের বিষয়। যদিও ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ অধিকাংশই আকবরের রাজপুত নীতি তথা হিন্দু নীতিকে প্রয়োজনভিত্তিক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সঠিকভাবে আকবরের উদার মানসিকতাকে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তা সর্বাংশে সত্য নয়। বাল্য ও কৈশোরে যে উদার পরিমণ্ডলে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তাতে তাঁর মনে মধ্যযুগীয় কোনও ধ্যানধারণার স্থান ছিল না। উপরন্তু তৎকালীন উলেমা ও উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারীদের বারংবার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নিজ ধর্মের মানুষদের প্রতি তিনি যে কিছুটা বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, তিনি কোনও প্রকার ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে নয়, অত্যন্ত উচ্চ এক রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

তবে বর্তমানকালে আলিগড় গোষ্ঠীর অন্যতম ঐতিহাসিক *ইকতিদার আলম খান* ইরফান হাবিব সম্পাদিত *"Medieval India"* গ্রন্থে আকবরের রাজত্বের প্রথমদিকের নীতিগুলির পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করে এমন কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেগুলি প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ যুক্তি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। অবশ্য তিনি বলেছেন, তাঁর এই মতামতগুলি সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষামূলক। তাঁর মতে, 1560-75 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দু'টি স্থানীয় গোষ্ঠী রাজকার্যে নিযুক্ত হয় এবং উচ্চপদগুলিতে পার্সীদের আনুপাতিক শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। এই দুটি স্থানীয় গোষ্ঠী হল, রাজপুত দলপতি এবং ভারতীয় মুসলমানরা। এরফলে অভিজাতশ্রেণীর তুরাণী চরিত্র ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে এবং প্রশাসনিক সংগঠনে চাঘতাই রীতিনীতির অবনতি ঘটে। এই ঘটনাই আকবরকে রাজকীয় ক্ষমতা সম্পর্কে বিকল্প তত্ত্ব অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর মতে, মুঘল আমলে আকবর স্বয়ং রাষ্ট্র পরিচালনার ভার হাতে নেওয়ার পর থেকে সরকারী কাজে রাজপুত কর্মী নিয়োগ শুরু হয়। *শেখজাদা* বা ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। আপাত দৃষ্টিতে 1561 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে আকবর মৈত্রী ও শান্তি স্থাপন করে রাজকার্যে এই দু'টি সম্প্রদায়ের বনেদী বংশজদের নিয়োগে উদগ্রীব ছিলেন। এর জন্যই তিনি রাজপুতদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এমনকি দিল্লী ও আগ্রাতে শেখজাদাদের সঙ্গেও একই নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু এ কাজে তিনি ব্যর্থ হন।

রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই আকবর 1562 খ্রীষ্টাব্দে তীর্থযাত্রা কর এবং 1564 খ্রীষ্টাব্দে জিজিয়া কর রদ করেন। ইকতিদার আলম খানের মতে, আকবর রাজপুতদের সঙ্গে যে উদার মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, তা রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই। কোনও ধর্মীয় উদারতা বা বৌদ্ধিক প্রভাবে নয়। তাঁর মতে, উজবেক বিদ্রোহ দমনের পর রাজপুতদের সম্বন্ধে আকবরের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। তিনি মৈত্রীর পরিবর্তে রাজপুতদের বলপূর্বক বশে রাখার নীতি গ্রহণ করেন এবং একই সঙ্গে গোঁড়া মুসলমান মানসিকতাকে খুশী রাখার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 1568 খ্রীষ্টাব্দে চিতোর দখলের পর এই জয়কে আকবর বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ইসলামের জয় বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এই জয়ের খবর দিয়ে পাঞ্জাবের ওমরাহ্-দের কাছে আকবর যে আদেশনামা পাঠিয়েছিলেন, তাকে ভারতের সবচেয়ে গোঁড়া মুসলমান শাসকদের যে কোনও আদেশনামার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই নীতিরই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হল 1575 খ্রীষ্টাব্দে জিজিয়ার পুনঃপ্রবর্তন, 1579 খ্রীষ্টাব্দে বহু বিতর্কিত *মাহ্জার*'-এর ঘোষণা, আজমীর শরিফে ভক্তি নিবেদন, সেলিম চিস্তির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ এবং মহাদবিদের প্রতি তাঁর বৈরীভাব এবং শুক্রবারে নমাজ, পাঠ প্রচলনের চেষ্টা। এগুলি আকবরের মুসলমান সনাতন প্রথায় আস্থাভাজন হওয়ার তীব্র বাসনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। উল্লেখ্য কাছোয়া ছাড়া প্রধান রাজপুত সর্দারদের সকলেই চিতোরের পতনের পর আকবরের অধীনে কাজে যোগ দিয়েছিলেন, তার আগে নয়।

এ থেকে মন হয়, মুঘল প্রশাসনে রাজপুতদের যোগদানের কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে। রাজপুতদের প্রতি আকবরের উদার মনোভাব তাদের প্রণোদিত করেনি। অবশ্য *ইকতিদার আলম খান* এ কথা স্বীকার করেছেন যে, 1580 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ আকবরের এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল। তারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, এই বছরেই দ্বিতীয়বার জিজিয়া রদ এবং মাহ্জার জারি নিঃশব্দে বাতিল করা। 1578 খ্রীষ্টাব্দের পর আকবর রাজপুতদের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কারণ মাহ্জারের ঘোষণার ফলে উলেমাদের বিরাগভাজন হন এবং তুরানি অভিজাতরা তাঁর উপর তুষ্ট না থাকায় মির্জা হাকিমের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আকবর রাজপুতদের উপর নির্ভর করতে থাকেন। তা সত্ত্বেও আকবরের রাজপুতদের প্রতি মিত্রতার নীতি ভারত ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে এবং এরই ফলে রাজপুত জাতি মুঘল সাম্রাজ্য রক্ষায় ও সম্প্রসারণে যে সংগ্রাম করেছিল, তার গুরুত্ব কম নয়।

সাম্প্রতিককালে সতীশ চন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন, মুঘল শাসনব্যবস্থায় রাজপুতদের অন্তর্ভুক্তি এবং অন্যান্য অভিজাতদের সঙ্গে তাদের সমপর্যায়ভুক্ত করা একটি *'composite ruling class'* নির্মাণ প্রক্রিয়ার অঙ্গ। তিনি আইন-ই-আকবরীতে প্রদত্ত 1575 থেকে 1595 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালের 500 বা তদুর্ধ মনসবদারদের একটি তালিকা তুলে ধরেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, এই ধরণের মোট 184 জন মনসবদারের মধ্যে হিন্দু 30 জন (16.30%), যার মধ্যে 27 জন রাজপুত; 64 জন তুরাণী (34.78%), ইরাণী 47 জন (25.54%) এবং হিন্দুস্তানী 34 জন (18.48%)। বাকি নয়জনের সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। কিন্তু তিনি মনে করেন, কেবলমাত্র এই পরিসংখ্যান হিন্দু অভিজাতদের ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্বন্ধে পরিস্কার চিত্র দিতে পারে না। যাঁরা হিন্দুদের ক্ষমতা ও গুরুত্ব বৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম বদায়ুনি দাবী করেছেন আকবরের রাজপুত মহিষীবর্গ হিন্দু রাজপুতদের প্রভাব বৃদ্ধির ব্যাপারে আকবরকে প্রভাবিত করেছিলেন। সতীশচন্দ্র আরও মনে করেন, আকবরের সময় থেকেই ভারতের জাতি-গোষ্ঠীগত ঐক্যকে বিনষ্ট করার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। তাই সেনাবাহিনীতে মিশ্রপ্রকারের জাতিগোষ্ঠীর সমাহার শুরু হয়েছিল। এইভাবে আকবর একটি ভারসাম্য আনার চেষ্টা করেছিলেন, তবে নানা কারণে তা পুরোপুরি সফল হয়নি। তথাপি আকবরের রাজপুত নীতি ছিল মুঘল শাসনকালে একটি অভিনব পদক্ষেপ।